প্রতিধ্বনি the Echo
Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed Indexed International Journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: https://www.thecho.in
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)

ভারতীয় তাঁতশিল্প বনাম ভোগবাদী পুঁজিবাদ

অভ্রদীপ ব্যানার্জী
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক,সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ভারত

Abstract

Indian handloom industry because of its roots within rich Mughal tradition has been one of the most talked about aspects in India. Many scholars have tried to understand it from different perspectives. Some these scholars often emphasize upon the how Indian handlooms, even with many difficulties, has manage to survive the dire effects of industrialization and abrupt commercialization. Again others often emphasize upon the internal dynamics of ever changing handloom tradition which is been a cause of concern. This article first provides a brief historical account of Indian handloom industry and then through a comparative overview of three relatively distinct handlooms weaving traditions of West Bengal it tries to illuminate Indian handloom industry's position within modern-day society which is driven by the forces of capitalism and consumerism.

Keywords: Indian Handloom Industry, Industrialization, Consumerism, Capitalism

প্রাককথন : হঠাৎ তাঁতশিল্প নিয়ে কেন লিখছি প্রথমে সেই কথায় আসি। সময়টা ইংরাজির ২০০৫ সালের প্রথমদিক, সেই সময় প্রথম নৃতত্ত্ব স্নাতোকত্তোর দ্বিতীয়বর্ষের পাঠ্যক্রমের অংশ হিসাবে তাঁতশিল্প ও শিল্পীদের সক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করি। আসলে কাজের বিষয় হিসাবে তাঁতশিল্পকে নির্বাচন করার ঘটনাটিও ভারি অদ্ভুতভাবেই ঘটে, আমার তৎকালীন চিন্তাভাবনার মধ্যে কাজের বিষয় হিসাবে দূরদূর পর্যন্ত তাঁতশিল্প বা তৎসর্ম্পকীয় কোন বিষয়ের কথা তখন পর্যন্ত আসেনি। সৌভাগ্যবশত ঠিক সেই সময়েই মার্গদর্শক হিসাবে ড. গোপালকৃষ্ণ চক্রবর্তী মশাইকে পেয়ে যাই। উনিই প্রথম আমাকে তাঁতশিল্প ও শিল্পীদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের কাজে অনুপ্রাণিত করেন।

অনেকেই জানেন যে এই তথ্যের উপর লিখিত রির্পোটের উপর ভিত্তি করেই স্নাতোকোত্তর পর্বের একটি পেপারের মূল্যায়ণ হয়ে থাকে। তাই তাঁতশিল্প বা তাঁতশিল্পের সাথে যুক্ত জনগোষ্ঠীদের সম্পর্কে ঠিক কি লিখব সেই ব্যাপারটা স্থির করতে পারছিলাম না। বিভিন্ন নথি, পুঁথি ঘেঁটে একটা বিষয় বুঝতে পারি যে ভারতে তাঁতশিল্প ক্রমে অবলুপ্তির পথে চলেছে। পরবর্তীকালে হুগলী জেলায় অবস্থিত বেগমপুর অঞ্চলের তাঁতী জনগোষ্ঠীর থেকে আমার নিজের সংগৃহীত তথ্যও কিয়দাংশে এই ক্রম-অবলুপ্তির তত্ত্বের সমর্থনে ইঙ্গিত প্রদান করে। এই কারণেই আমার মার্গদর্শক ড. গোপালকৃষ্ণ চক্রবর্তী মশাইয়ের সাথে একপ্রস্থ কথা বলার পর স্থির হয় যে আমার সংগৃহীত তথ্যের রূপটির শীর্ষক হবে 'বাংলার তাঁতশিল্প ও তার ক্রম-পরিবর্তন'।

এরপর বেশ কয়েকবছর অতিক্রান্ত হয়েছে, স্নাতোকোত্তর পর্বের পাঠ চুকিয়ে ২০০৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগে গবেষক হিসাবে যোগদান করি ও পর্যায়ক্রমে পি.এইচ.ডি. গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহের সুবাদে আরও দুটি ভিন্ন তাঁতশিল্পী গোষ্ঠীর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়। এই দুই তাঁতশিল্পী গোষ্ঠীর একটি হুগলী জেলার ধনিয়াখালী অঞ্চলে ও অন্যটি বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর অঞ্চলে বসবাসকারী। মজার ব্যাপার এটাই পি.এইচ.ডি. গবেষণা চলাকালীনও মার্গদর্শক হিসাবে আমি ড. গোপালকৃষ্ণ চক্রবর্তী মশাইকেই পাই। এই পর্যায়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থাবলী পড়ার অফুরন্ত সুযোগ মেলে যা স্নাতোকোত্তর পর্যায়ের ছাত্র হিসাবে একেবারেই উপলব্ধ ছিলনা। পর্যায়ক্রমে আমার এই তিন তাঁতশিল্পী গোষ্ঠীর থেকে সংগৃহীত তথ্যও অনেকাংশেই আমার পূর্ব-অভিজ্ঞতার সাথে সাজুয্যের অভাব দর্শায়। এই সমস্ত তথ্য ও ড. গোপালকৃষ্ণ চক্রবর্তী মশাইয়ে সাথে বিভিন্ন আলোচনার ভিতর দিয়ে বুঝতেপারি যে স্নাতোকোত্তর স্তরের লিখিত রিপোর্ট ও তার ব্যাখ্যা

অন্যভাবেও হতে পারত। আজ ২০১৪ সালে সে ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছে, তাই বিষয় হিসাবে তাঁতশিল্প ও তাঁতশিল্পের পরিবর্তনের উৎস স্বরূপ ভোগবাদ ও পুঁজিবাদের অবতারনা।

ভারতে তাঁতশিল্প ও তার ঐতিহাসিক পটভূমি : ভারতে তাঁতশিল্পর ইতিহাস বহুজনবিদীত। অনেকেই তাঁতশিল্পকে চাষাবাদ ও কলকারখানার একটি মধ্যবর্তী পর্যায় হিসাবে গণ্য করেন। এইসকল পন্ডিতদের মতে, প্রাচীনকালে মানুষ প্রথমে গাছের ও পশুর লোমকে সুতো হিসাবে ব্যবহার করে নিজেদের প্রয়োজনে বস্ত্র নির্মাণ করে। এরপর পর্যায়ক্রমে মানুষ ধীরে ধীরে তুলোর চাষ ও চরকার ব্যবহার শেখে যা পরবর্তী সময়ে তাঁতশিল্পের সাথে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িয়ে পড়ে।

ভারতীয় তাঁতশিল্পের ভিত্তি মূলত মুঘলযুগ তথা তারও পূর্বতন সময়কালীন। এটা মনে করা হয় যে তুলোর চাষের সর্বপ্রথম গোড়াপত্তন এই ভারতবর্ষেই হয়েছিল, এবং এখান থেকেই তা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতীয় তুলোচাষীরা তাঁদের বিশেষ দক্ষতার কারণে বহুবছর এই বিষয়ে আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এরপর মুঘল আমলেই প্রথম তাঁতশিল্পের কাঠামোর আগাগোড়া পরিবর্তন ঘটে। এই আমলেই তাঁতশিল্প প্রথম গৃহস্থলীর আঙ্গিক ছেড়ে সমষ্টিগত শিল্পের আকার লাভ করে। মুঘল পৃষ্ঠপোষকরাই প্রথম তাঁদের নিজেদের চাহিদা মেটাবার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তের তাঁতশিল্পীদের তাঁদের ছত্রছায়ায় তাঁত সামগ্রী প্রস্তুত করাতে উৎসাহিত করেন। যদিও পরবর্তী সময়ে এই পৃষ্ঠপোষকতার কারণেই তাঁতশিল্পীদের মধ্যে রাষ্ট্রের প্রতি এমন এক প্রগাঢ় নির্ভরশীলতা জন্মায় যা তাঁদের ভবিষ্যত স্বাবলম্বীতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

এরপর বহুকাল ধরেই তাঁতশিল্প বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হিসাবে আজও প্রতীয়মান। ভারতবর্ষ মুঘলযুগ অতিক্রম করে বহুদিন ইংরেজ পরাধীনতার শিকলে আবদ্ধ থেকেছে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাঁতশিল্প ও শিল্পীদের ইংরেজ শাসনের বহু কুফলের সম্মুখীন হতে হয়েছে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ও কলকারখানার বহুলবিস্তার এদের মধ্যে অন্যতম কারণ সমূহের অন্তর্গত। এই ব্যাপারে পন্ডিতদের একাংশ মনে করেন যে ভারতীয় তাঁতশিল্পের দুরবস্থার মূলে এই দুই শক্তির অবদান প্রধান। যদিও এই মতবাদের বিপরীতমুখী মতপোষণকারীদের সংখ্যাও নেহাত কম নয়, তথাপি বলা যেতেই পারে ভারতে তাঁতশিল্প ও লোকসংস্কৃতির পরিবর্তনের মূলস্রোতের উৎসে এই দুই শক্তি।

বর্তমানের নিরীখে তাঁতশিল্প ও শিল্পীদের অবস্থা : যদি আমরা তাঁতশিল্পের বর্তমান অবস্থার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহলে দেখা যায় বর্তমানে তাঁতশিল্প তার পূর্বতন সংস্কৃতির বহুলাংশ পরিবর্তিত এক কাঠামো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কর্মসংস্কৃতি থেকে শুরু করে ব্যবসায়িক রীতিনীতি সবকিছুরই আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। তাঁতশিল্পীগোষ্ঠির দক্ষতা যেখানে একসময় প্রধান বিচার্য বিষয় হিসাবে গণ্য হত সেখানে এখন ব্যক্তিবিশেষের আর্থিক সামর্থ ও ব্যবসায়িক যোগাযোগই প্রাধান্য লাভ করেছে। একদিকে যেমন আজও বিভিন্ন তাঁতশিল্পীগোষ্ঠি তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারাই ব্যবসায়িক লেনদেন সমাধা করে থাকেন, তেমনই অন্যদিকে অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা বিভিন্ন তাঁতশিল্পীগোষ্ঠিকে আত্মীয়-স্বজনদের এই যোগাযোগ সমূহের উপর পুরোপুরি নির্ভর করতে বাধা দেয়। তাই বলা যেতে পারে তাঁতশিল্প বস্তুত আজও তার প্রাচীন কঙ্কাল নিয়ে বর্তমান পুঁজিবাদ ও ভোগবাদের যুগে নিজস্বতা বজায় রাখতে কিয়দংশে সক্ষম হয়েছে। বেগমপুর, ধনিয়াখালী ও বিষ্ণুপুর অঞ্চলে ক্ষেত্রসমীক্ষালব্ধ আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতাও এই তত্ত্বের সমর্থন করে।

বেগমপুর অঞ্চলের তাঁতশিল্প : বেগমপুর হুগলী জেলায় অবস্থিত একটি স্থান। এটি শ্রীরামপুর মহকুমা তথা চন্ডীতলা ২ নং ব্লকের অন্তর্গত। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এই অঞ্চলের লোকসংখ্যা ৯৫৪৫, যারমধ্যে ৫১ শতাংশ পুরুষ ও ৪৯ শতাংশ মহিলা। বহুযুগ থেকেই এই অঞ্চলের মানুষ ও তাঁতশিল্প এই অঞ্চলের লোক-ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে এসেছে। একাধারে এই অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গা, সৌধ ও ঐতিহাসিক নিদর্শন যেমন বাংলায় মুঘলযুগের প্রসার ও প্রভাবের ইঙ্গিত বহন করে, তেমনি এই অঞ্চলের মোটাপেড়ে শাড়ি ও তাঁতশিল্পীদের উল্লেখ বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে মেলে। বর্তমানে এই অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষই চাকুরীজীবি। এদের মধ্যে বৃহৎ একটি অংশ তাঁদের জীবিকা নির্বাহের জন্য কলকাতা তথা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যাতায়াত করে থাকেন।

বেগমপুর অঞ্চলের তাঁতশিল্পীরা একধরনের Frame Loom ব্যবহার করে থাকেন যা এই অঞ্চলে খটখটি-তাঁত নামেও পরিচিত। এই ধরনের তাঁতযন্ত্র চারটি আয়তাকার খুঁটির উপর বসানো থাকে। আয়তাকার খুঁটির উপর বসানো এই তাঁতযন্ত্রগুলিতে পাটি, গুটি, দোকতি, সানা, মাকু, ম্যেড়া প্রভৃতি বিভিন্ন অংশ থাকে। অন্যান্য বিভিন্ন প্রকারের তাঁতযন্ত্রে এই সব অংশ থাকলেও তাদের সাথে এই অঞ্চলের তাঁতযন্ত্রের তফাৎ অনেকটাই। এই তাঁতযন্ত্রগুলিকে তাঁতশিল্পীরা প্রায়শই নিজেদের প্রয়োজনের খাতিরে একস্থান থেকে অন্যস্থানে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে থাকেন। কেবলমাত্র আকারগত দিক থেকেই নয়, কার্যকারীতা ও কর্মপদ্ধতির নিরিখেও বেগমপুর অঞ্চলের তাঁতযন্ত্রগুলি বেশ আলাদা। এই অঞ্চলের তাঁতযন্ত্রগুলি কেবলমাত্র কতকগুলি সরল নকশা প্রস্তুতির জন্যই বিশেষভাবে উপযোগী।

এই অঞ্চলের তাঁতশিল্পীরা কতকগুলি পুর্বনির্ধারিত পর্যায়ে তাঁতসামগ্রী প্রস্তুত করে থাকেন। প্রথমে বাজার থেকে কেনা কাঁচা সুতোকে রঙ করা হয়, এরপর এই সুতোকে ভালোভাবে মাড়দিয়ে চরকির সাহায্যে লাটাই নামক একটি অংশে গোটানো হয় এবং তাকে রোদে শুকোতে দেওয়া হয়। শুকানোর পর এই সুতো থেকে দুইধরনের নলী (ছোট ও বড়) প্রস্তুত করা হয়। এরপর বড় নলী গুলি দিয়ে ড্রাম নামক একপ্রকার যন্ত্রের সাহায্যে তাঁতযন্ত্রের পাটি আংশটিতে টানা সুতো গোটানো হয় এবং সর্বশেষে পাটি অংশটি তাঁতযন্ত্রে লাগিয়ে তাঁতশিল্পীরা তাঁতসামগ্রী প্রস্তুত করেন।

এই প্রত্যেক প্রকার কাজের জন্য আবার নির্দিষ্ট ধরনের লোক নিযুক্ত যা এই অঞ্চলের তাঁতশিল্প সম্বন্ধীয় কর্মবিন্যাসকে প্রতীয়মান করে। যেমন, সুতো রঙ করার সাথে এই অঞ্চলেরই একদল মানুষ যুক্ত, এরা কেবলমাত্র সুতো রঙ করার কাজ করেই এঁদের জীবিকা নির্বাহ করেন। তাঁতি সম্প্রদায়ভুক্ত মহিলা ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আবার সাধারণত সুতোয় মাড় দেওয়া ও নলী তৈরির কাজ করেন। প্রায় প্রত্যেক তাঁতি ঘরেই এই সব কাজের প্রচলন থাকায় এই সকল কাজের জন্য প্রয়োজনীয় নৈপুন্য তাঁতি সম্প্রদায়ভুক্ত মহিলা ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আলাদা ভাবে অর্জন করতে হয়না, কারণ অত্যন্ত ছোট বয়স থেকে দেখার কারণে এই নৈপুন্য এঁরা সহজাতভাবেই অর্জন করেন। পাটি প্রস্তুত করার কাজ আবার বিশেষভাবে দক্ষ একদল কারিগরগোষ্ঠীই করে থাকেন। এঁরা প্রথমে অনেকগুলি বড় নলীকে কঠের ফ্রেমের মধ্যে আটকে দেন। এরপর সেখান থেকে তাঁতসামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ি একটি একটি করে সুতো নিয়ে পাটির মধ্যে গোটাতে থাকেন। পাটি তৈরি হয়ে গেলে তাকে তাঁতের সাথে লাগানোর আগে প্রত্যেক সুতোকে আবার সানার মধ্যে দিয়ে গলানো হয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই কাজটি একদল দক্ষ কারিগররা করে থাকেন। তবে সাধারণত প্রত্যেক তাঁতশিল্পীরাই এই কাজের কর্মকুশলতার সাথে পরিচিত এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাঁরা তাঁতবোনার সাথে সাথে কখনো কখনো এই কাজও করে থাকেন।

বেগমপুর অঞ্চলের তাঁতশিল্পীরা মূলত তিন ধরনের শাড়ি তৈরি করেন। এদের মধ্যে 'কাটা-নকশা', 'বুটি' ও 'মাটা-শাড়ি' উল্লেখযোগ্য। এই তিন ধরনের শাড়িই নকশা ও কারিগরি উৎকৃষ্টতার নিরীখে অন্যান্য অঞ্চলে প্রস্তুত তাঁতসামগ্রীর তুলনায় অনেকটা পিছিয়ে। তাঁতসামগ্রীর প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত কাঁচামাল ও তাঁতযন্ত্রের বিশেষ ধরনের কর্মপদ্ধতি এই অঞ্চলে প্রস্তুত তাঁতসামগ্রী সমূহকে কারিগরি উৎকর্ষতার নিরীখে পিছিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিয়েছে। সাম্প্রতিক কালে এই অঞ্চলের তাঁতশিল্পীরা অনেক ক্ষেত্রেই পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রস্তুত তাঁতসামগ্রীর নকশা অনুকণ করার ফলে এই পরিস্থিতির কিয়দংশে পরিবর্তন ঘটেছে।

বেগমপুর অঞ্চলের তাঁতশিল্পীদের অবনতির পিছনে ঐ অঞ্চলে ক্রমবর্ধিষ্ণু যন্ত্রচালিত তাঁতশিল্পের অবদান সবথেকে বেশি। যে সমস্ত ব্যবসায়ী বা বিনিয়োগকারীরা আগে হস্তচালিত তাঁতশিল্পে বিনিয়োগ করতেন, তাঁরা অধিক লাভের আশায় আজ যন্ত্রচালিত তাঁতশিল্পের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট। এর ফলে বেগমপুর অঞ্চলের তাঁতি কর্মীসমুদায়ের একটি বৃহৎ অংশ কর্মহীনতার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এবং যে সমস্ত কারিগরবৃন্দ আজও তাঁতশিল্পের সাথে যুক্ত আছেন তাঁরা যন্ত্রচালিত বস্ত্রসামগ্রীর প্রভাবে অদূরবর্তী ভবিষ্যতেই কর্মহীন হয়ে পড়ার আশঙ্কাতে ভুগছেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই অঞ্চলের তাঁত সমবায় সমিতিগুলি এই সকল সমস্যার মোকাবিলা করতে অক্ষম। সমবায় সমিতী সমূহের কর্মচারীবৃন্দের অকার্যকারীতা ও মূলধনের অভাবই তাঁদের অক্ষমতার প্রধান কারণ।

ধনিয়াখালী অঞ্চলের তাঁতশিল্প : ধনিয়াখালী হুগলী জেলায় অবস্থিত। এটি চুঁচুড়া মহকুমার অন্তর্গত একটি ব্লক। এই ব্লক বেলমুড়ি, ভান্ডারহাটি - ১, ভান্ডারহাটি - ২, দশঘরা - ১, ধনিয়াখালী - ১, ধনিয়াখালী - ২, গোপীনাথপুর - ১, গোপীনাথপুর - ২, গুড়াপ, হাজিগড় প্রভৃতি গ্রাম পঞ্চায়েতের সমন্বয়ে গঠিত। ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে এই অঞ্চলের জনসংখ্যা ২৯৩৩০৫, যার মধ্যে ১৪৮২৬৫ জন পুরুষ ও ১৪৫০৪০ জন মহিলা। তাঁতশিল্প ছাড়াও এই অঞ্চলের মানুষজন মূলত কৃষিকার্যের সাথে যুক্ত। আলু, ধান ও বিভিন্ন প্রকারের শাক-সব্জির চাষবাস এই অঞ্চলে কৃষিকার্যের মূল ভিত্তি। এছাড়াও এই অঞ্চলে প্রস্তুত তাঁতসামগ্রীর উৎকৃষ্টতার কারণে এই অঞ্চলের তাঁতশিল্পীগোষ্ঠীর নাম সর্বজনবিদীত।

ধনিয়াখালী অঞ্চলের তাঁতশিল্পীরা একধরণের Pit Loom ব্যবহার করে থাকেন। বেগমপুর অঞ্চলে ব্যবহৃত তাঁতযন্ত্রের থেকে ধনিয়াখালী অঞ্চলের তাঁতযন্ত্রগুলি আকারে ও কর্মপদ্ধতিগত দিক থেকে বেশ আলাদা। প্রথমত এই অঞ্চলের তাঁতযন্ত্রগুলি বেগমপুর অঞ্চলের ব্যবহৃত চারটি আয়তাকার খুঁটির পরিবর্তে মাটির মধ্যে আয়তাকার গর্ত করে তার মধ্যে বসানো থাকে। তাঁতযন্ত্রগুলিতে লরজ/নরজ (বেগমপুর অঞ্চলে যা পাটি নামে পরিচিত), দোকতি, সানা, মাকু, ম্যেড়া প্রভৃতি বিভিন্ন মূল অংশ থাকলেও এই অঞ্চলের তাঁতগুলি জটিল ও বৃহদাকৃতি নকশা প্রস্তুতিতে বিশেষ ভাবে সক্ষম। প্রায় সব ক্ষেত্রেই তাঁতশিল্পীরা নকশা প্রস্তুতিতে জ্যাকার্ড নামক একধরণের মেশিন ব্যবহার করেন যা বুননের সময় বিভিন্ন প্রকারের ফুল ও জীবজন্তুর প্রতিকৃতি তৈরিতে সাহায্য করে।

ধনিয়াখালী অঞ্চলের তাঁতশিল্পীরাও বেগমপুর অঞ্চলের তাঁতশিল্পীদের মত কতকগুলি পুর্বনির্ধারিত পর্যায়ে তাঁতসামগ্রী প্রস্তুত করে থাকেন। আপাত দৃষ্টিতে এই দুই অঞ্চলে তাঁতসামগ্রী প্রস্তুতির পুর্বনির্ধারিত পর্যায়গুলির মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ নেই। বাজার থেকে কেনা কাঁচা সুতোকে রঙ করা, এরপর এই সুতোকে ভালভাবে মাড় দিয়ে চরকির সাহায্যে লাটাই নামক একটি অংশে গোটানো এবং তাকে রোদে শুকোতে দেওয়া, সুতো শুকানোর পরেই সুতোর থেকে দুইধরনের নলী (ছোট ও বড়) প্রস্তুতকরা, এরপর বড় নলীগুলি দিয়ে ড্রাম নামক একপ্রকার যন্ত্রের সাহায্যে তাঁতযন্ত্রের লরজ নামক অংশটিতে টানা সুতো গোটানো, এবং সর্বশেষে লরজ অংশটি তাঁতযন্ত্রে লাগিয়ে তাঁতশিল্পীদের তাঁতসামগ্রী প্রস্তুত করা পর্যন্ত সব কটি ক্ষেত্রেই কর্মপদ্ধতির সাযুজ্য পাওয়া যায়।

কিন্তু এই প্রত্যেকটি পর্যায়ে কাজের ক্ষেত্রেই ধনিয়াখালী অঞ্চলের তাঁতশিল্পীরা অনেক মনোযোগী ও কারিগরী দক্ষতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। উপরন্তু তাঁতসামগ্রীর প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত কাঁচামাল ও তাঁতযন্ত্রের বিশেষ ধরনের কর্মপদ্ধতি এই অঞ্চলে প্রস্তুত তাঁতসামগ্রীসমূহকে কারিগরী উৎকর্ষতা প্রদান করে, যার নিরীখে এই অঞ্চলে প্রস্তুত প্রায় প্রতিটি তাঁতসামগ্রীই বেগমপুরের থেকে অনেক এগিয়ে।

তাঁতশিল্প সম্বন্ধীয় কর্মের কর্মবিন্যাসের ক্ষেত্রও এই দুই অঞ্চলের তাঁতশিল্পীদের মধ্যে সাযুজ্য লক্ষ্যণীয়। বিশেষ একদল মানুষের সুতো রঙ করা, তাঁতি সম্প্রদায়ভুক্ত মহিলা ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সুতোয় মাড় দেওয়া ও নলী তৈরির কাজ করা, বিশেষভাবে দক্ষ একদল কারিগরগোষ্ঠীর লরজ প্রস্তুত করা, লরজ তৈরি হয়ে গেলে তাকে তাঁতের সাথে লাগানোর আগে প্রত্যেক সানার মধ্যে দিয়ে গলানো এবং সর্বশেষ তাঁতবোনা সবক্ষেত্রেই তাঁতশিল্প সম্বন্ধিয় কর্মের কর্মবিন্যাস একইরকম।
ধনিয়াখালী অঞ্চলের তাঁতশিল্পীগোষ্ঠীদের অবস্থা বেগমপুর অঞ্চলের তাঁতশিল্পীদের তুলনায় কিয়দংশে পৃথক। এই অঞ্চলে তাঁত সমবায় সমিতিগুলির প্রতিটিই তাদের কার্যকারীতার নিরীখে সফল। তাঁতশিল্পীদের নিয়মিত কর্মসংস্থান ও নির্দিষ্ট কর্মের বিনিময়ে মজুরী প্রদান সেই সফলতার বার্তা বহন করে। এতৎসত্ত্বেও তাঁতশিল্পীরা তাঁদের জীবন ও পেশার প্রতি পূর্বতন সেই প্রগাঢ় টান আর অনুভব করেন না। প্রয়োজনের তুলনায় কম মজুরী তাঁতশিল্পীদের জীবনাধারনের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহের জন্য একেবারেই অনুপযোগী। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মজুরীর এই অনুপযোগীতা ও ধনী-দরিদ্রের মধ্য ক্রমবর্ধমান এই ব্যবধান তাঁতশিল্পীদের তাঁদের পেশার প্রতি অনুগত থাকতে অপারঙ্গম করে তুলছে।

বিষ্ণুপুর অঞ্চলের তাঁতশিল্প : বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত। এটি একইসাথে একটি গঞ্জ এবং পৌরসভা কারণ এই অঞ্চলের বেশিরভাগ অংশই আজও পুরানো স্থাপত্য ও ঘরবাড়ির দেখা মেলে যা এই অঞ্চলের ঐতিহ্যশালী অতীতের সাক্ষী। বিভিন্ন প্রাচীন সৌধ, মন্দির ও মন্দিরের গায়ে খোদিত টেরাকোটার নকশা বাংলার অষ্টদশ শতাব্দীর স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন হিসাবে আজও বেঁচে আছে। আবার এই অঞ্চল বর্তমান কালের সুযোগ সুবিধা থেকেও একেবারে বঞ্চিত নয়। এই অঞ্চলের মানুষজন স্কুল, কলেজ, ব্যাঙ্ক, হাসপাতাল থেকে শুরু করে সমস্ত রকম আধুনিক সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন যা আর পাঁচটা পৌরসভা অঞ্চলে উপলব্ধ। ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে বিষ্ণুপুর অঞ্চলের জনসংখ্যা ৬১৯৪৩ যার মধ্যে ৫০ শতাংশ পুরুষ ও ৫০ শতাংশ মহিলা।

বিষ্ণুপুর অঞ্চলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। গুপ্তযুগে গুপ্তরাজাদের শাসনের অধীনে থাকা ব্যতিত একসময় এই অঞ্চল প্রায় একহাজার বছরেরও বেশি সময়কাল ধরে মল্লরাজাদের রাজধানী ছিল। এই কারণে অনেকেই বিষ্ণুপুর অঞ্চলকে মল্লভূম নামেও অভিহিত করেন। এছাড়া বিষ্ণুপুর অঞ্চল চিত্রকলা ও ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আখড়া হিসাবেও বিশেষভাবে পরিচিত। এরপর আসে এই অঞ্চলে রেশম-সুতো থেকে প্রস্তুত বালুচরী শাড়ি, যা জগৎ বিখ্যাত। বিশেষত এই অঞ্চলের তসর অঞ্চলের সুতো থেকে প্রস্তুত রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন পালার নকশা সমৃদ্ধ বালুচরী শাড়ির ক্রেতা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে।

বিষ্ণুপুর অঞ্চলের বেশিরভাগ অংশই পৌরসভার অন্তর্গত এবং এই অঞ্চলে কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অত্যন্ত অপ্রতুল। তাই এই অঞ্চলে উপার্জনকারী মানুষের বৃহৎ একটি অংশ রেশম-সুতোর বস্ত্রসামগ্রী প্রস্তুতের মাধ্যমে তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করেন। উপার্জনকারী জনগোষ্ঠীর আরেকটি বৃহৎ অংশ জীবিকা নির্বাহের খাতিরে বাঁকুড়া তথা বিষ্ণুপুর সংলগ্ন এলাকাতে যাতায়াত করে। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার চাকুরীর খাতিরে সুদূর কলকাতা পর্যন্ত এসে থাকেন। এছাড়াও এই অঞ্চলের বেশ কিছু মানুষ শাঁখারীর কাজ ও পিতলের বাসনপত্র নির্মানের কাজের সাথেও যুক্ত।

বিষ্ণুপুর অঞ্চলের তাঁতশিল্পীরাও একধরণের Pit Loom ব্যবহার করেন। এই তাঁতযন্ত্রগুলিও ধনিয়াখালী অঞ্চলের তাঁতযন্ত্রগুলির মত আয়তাকার গর্ত করে তার মধ্যে বসানো থাকে। যদিও আকারে কর্মপদ্ধতিগত দিক থেকে বিষ্ণুপুর অঞ্চলের তাঁতযন্ত্রগুলি বাকি দুই অঞ্চলের তুলনায় বেশ আলাদা। তাঁতযন্ত্রগুলিতে লরজ/নরজ, দোকতি, সানা, মাকু প্রভৃতি বিভিন্ন মূল অংশ থাকলেও এই অঞ্চলের তাঁতগুলির কর্মপদ্ধতি জটিলতম। বস্ত্র তৈরির সময় কখন কখন একই সাথে দুটি জ্যাকার্ড মেশিন ব্যবহৃত হওয়ায় এই তাঁতযন্ত্রগুলি বৃহদাকৃতি নকশা প্রস্তুতিতে বিশেষ ভাবে সক্ষম। এছাড়াও কর্মপদ্ধতিগত দিক থেকে আরেকটি বিষয় বিষ্ণুপুর অঞ্চলের তাঁতযন্ত্রগুলিকে বাকি দুই অঞ্চলের থেকে পৃথক করে। এই অঞ্চলের তাঁতশিল্পীরা বেগমপুর ও ধনিয়াখালী অঞ্চলের তাঁতশিল্পীদের মত মাকুকে হাতলের টানের মাধ্যমে টানা-সুতোর মধ্যে দিয়ে চালনা করেন না, বরং পুর্বনির্ধারিত নক্সার প্রয়োজনীয়তাকে মাথায় রেখে তাঁতশিল্পীরা একই সাথে পর্যায়ক্রমে ৭ থেকে ৮ টি মাকুকে নিজেদের হাত দিয়ে টানা-সুতোর মধ্যে দিয়ে গলিয়ে বস্ত্র বুননের কাজ সমাধা করেন।

তাঁতযন্ত্রের ন্যায় বিষ্ণুপুর অঞ্চলে তাঁতসামগ্রী প্রস্তুতের ক্রমপর্যায়গুলিও বাকি দুই অঞ্চলের থেকে অনেকাংশে পৃথক। বাজার থেকে কেনা রেশম-সুতোকে প্রথমে রঙ করা হয়, এই সুতোকে ভালোভাবে মাড় দিয়ে চরকির সাহায্যে এই সুতো থেকে এলা ও পাকনী নামক দুই প্রকার সুতো তৈরি করা হয়। এলা সুতোকে এরপর আরেক ধরনের চরকার সাহায্যে ফাঁদালির মধ্যে গুটানো হয় এবং ফাঁদালিগুলিকে পুরুনি করার জন্য পাঠানো হয়। পাকনী সুতোকে চরকার মাধ্যমে ছোট নলীতে গোটানো হয় যাকে তাঁতশিল্পীরা বস্ত্র তৈরির সময় মাকুর মধ্যে ভরে ব্যবহার করেন। পুরুনির কাজ করার সময় এলা সুতোকে প্রয়োজন অনুসারে দেওয়ালে টাঙানো কতকগুলি গোঁজের সাহায্যে **এক ব্যাক্তি** কাঠের লাঠির মধ্যে বলের মত আকৃতিতে গোটানো হয়। এরপর এই গোটানো সুতোকে সানার মধ্যে দিয়ে ভরে তাকে নরজের মধ্যে গোটানো হয়। এই অঞ্চলের ধাল-নরজ নামে পরিচিত। সর্বশেষে এই নরজ তাঁতযন্ত্রে লাগিয়ে তাঁতশিল্পীরা বস্ত্র তৈরি করেন।

তাঁতশিল্প সম্বন্ধীয় কর্মের কর্মবিন্যাসের ক্ষেত্রও বিষ্ণুপুর অঞ্চল বাকি দুই অঞ্চলের তুলনায় কিছুটা পৃথক। যেমন সুতো রঙ করার কাজটি এই অঞ্চলের তাঁতশিল্পীরা নিজ গৃহেই সমাধা করে থাকেন। রঙ করার পুঁথিগত প্রশিক্ষণ না থাকলেও বহুদিনের অভ্যাস ও বংশপরম্পরায় এই কাজের সাথে যুক্ত থাকার কারণে তাঁতশিল্পীরা বেশ সহজাত ভাবেই এই কাজ করে থাকেন। বাড়ির মহিলা ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তঁদের এই কাজে সাহায্য করে থকেন। সুতোয় মাড় দেওয়া ও নলী তৈরির কাজ

আবার বাকি দুই অঞ্চলের ন্যায় কেবলমাত্র তাঁতি সম্প্রদায়ভুক্ত মহিলা ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাই করেন। পুরুনির বা নরজ প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে, এরপর প্রত্যেক সুতোকে সানার মধ্যে দিয়ে গলানো অথবা লরজকে তাঁতের সাথে লাগানো সর্বোপরি তাঁতবোনা প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রেই বিশেষ দক্ষতা সম্পন্ন একদল কারিগরগোষ্ঠীর প্রভাব লক্ষ্যনীয়।

শিল্পগত উৎকর্ষতার দিক থেকেও এই তিন অঞ্চলের মধ্যে বিষ্ণুপুর সেই অর্থে সবথেকে বেশি সমৃদ্ধ। এই অঞ্চলে প্রস্তুত প্রতিটি বস্ত্র সামগ্রীর চাহিদা বিপুল। এদের মধ্যে এই অঞ্চলে প্রস্তুত ছোট-আঁচল, বড়-আঁচল, ব্রোকেড ও অলওভার শাড়ি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারিগরী **উৎকৃষ্টতার নিরীখে এই অঞ্চলে প্রস্তুত প্রত্যেক্তি উৎপাদ সামগ্রী বাকী দুই অঞ্চলের বস্ত্র সামগ্রীর** তুলনায় অনেকাংশে এগিয়ে। কার**ণ** প্রায় প্রতিটি রেশম শাড়িই **ন**কশা**ই** কোন না কোন পৌরা**ণি**ক গাথার অনুকরণে তৈরি যা এদের পৃথক শ্রেণীভুক্ত করে।

সেই কারণে বিষ্ণুপুর অঞ্চলের তাঁতশিল্পীরা অপেক্ষাকৃত বেশি নিশ্চিন্ত। তাঁদের বাকি দুই অঞ্চলের তাঁতশিল্পীদের ন্যায় অহরহ যন্ত্রচালিত তাঁতনির্মিত বস্ত্রসামগ্রীর সাথে প্রতিযোগিতার সম্মু**খী**ন হতে হয়না। ক্রম-কা**রি**গরী উৎকর্ষতার নিরীখে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে প্রস্তুত প্রতিটি তাঁত সামগ্রী একেবারেই অননুকর**ণী**য়। আর এই উৎকর্ষতাই বহুলাংশে তাঁতশিল্পীদের রক্ষাকবচের কাজ করে। বিষ্ণুপুর অঞ্চলের তাঁতশিল্পীদের সমস্যা আভ্যন্তরী**ণ**। এই সব সমস্যা মূলত বিনিয়োগকারী ও কারীগরিগোষ্ঠীর চিরকালীন দ্বন্দ্বের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মূলধনের অভাব কা**রি**গরগোষ্ঠীকে বিনিয়োগকারীদের মত নিজেদের জন্য উৎপাদন করাতে বাধাপ্রদান করে। ফলস্বরূপ কারিগর সম্প্রদায়কে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কর্মের বিনিময়ে মজুরী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা জীবনযাপনের জন্য একেবারেই অনুপযোগী।

উপসংহার :

সুতরাং এই তিনটি তাঁতশিল্পীগোষ্ঠীর তুলনামূলক আলোচনা থেকে এটা পরিস্কার যে তাঁতশিল্প ও তাঁতশিল্পীগোষ্ঠীদের সমাজ পরিবর্তনের কোনো একটি মাত্র নির্দিষ্ট কারণ নেই, বরং তা বিবিধ। বিশ্বায়নের কল্যাণে বর্তমানে সমাজের সবক্ষেত্রেই আজ ভোগবাদী সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্যণীয়। সারা বি**শ্বে**ই আজ ভোগবাদি শক্তির জয়যাত্রা এবং আমাদের সমাজ ও বিভিন্ন প্রকারের লোকাচার এই ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনের অংশীদার। টেলিভিশন ও প্রচার মাধ্যমের কল্যাণে আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি, হাঁটাচলা, সাজ-পোশাক ক্রয়-বিক্রয়ে রীতিনীতির ধারার আমূল পরিবর্তন এসেছে। ক্রেতাদের বহুলাংশই আজ ব্রান্ড কনসাস (Brand Conscious) । নিত্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবহার্য বস্তুর ক্ষেত্রেই মানুষ ব্যক্তিগত চাহিদার পরিপূরণের চেয়ে নির্দিষ্ট বিপনি সামগ্রীর ব্যবহারের ব্যাপারে বেশি উৎসাহী।

বস্ত্রসামগ্রীর ব্যবহারের ব্যাপারে মানুষের এই ব্রান্ড কনসাসনেসের (Brand Consciousness) প্রভাব সব থেকে বেশি পরিলক্ষিত হয়। আজ আমাদের যুব সমাজের (পুরুষ ও নারী উভয়েই) বড় একাংশ ভারতীয় পারম্পরিক পোষাক ব্যবহারে একেবারেই অনুৎসাহী। ক্রমপরিবর্তনশীল সময় ও সমাজব্যবস্থার সাথে সাজুয্য রক্ষার স্বার্থে বর্তমান যুব সমাজের একাংশ পাশ্চাত্য পোষাক-আশাক ও রীতিনীতিকে অবলম্বন হিসাবে বেছে নিয়েছে।

খুব স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় পারম্পরিক পোষাকের (পুরুষদের ক্ষেত্রে ধুতি-পাঞ্জাবি ও মহিলাদের ক্ষেত্রে শাড়ি) চাহিদার হ্রাস দেখা গেছে। বিশ্বায়নের প্রভাবে যেহেতু নিত্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবহার্য বস্তুর উৎপাদনই ক্রমে বাজার-কেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে, সেহেতু ভারতীয় পারম্পরিক পোষাকের চাহিদার এই হ্রাস তাঁতি সম্প্রদায়ের একাংশকে (কারিগরী দক্ষতার নিরিখে যারা এখনও অনেক পিছিয়ে) চরম অনিশ্চয়তার মুখে ফেলে দিয়েছে। এঁদের অনেকেই তাঁতকে অবলম্বন করে তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহে অসমর্থ। তাই তাঁতিসম্প্রদায়ের এই অংশের মধ্যে পেশা হিসাবে তাঁত ক্রমে তার জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলছে। ফলস্বরূপ তাঁতশিল্প ও এর সাথে জড়িত পারম্পরিক রীতিনীতিরও রদবদল ঘটেছে।

***